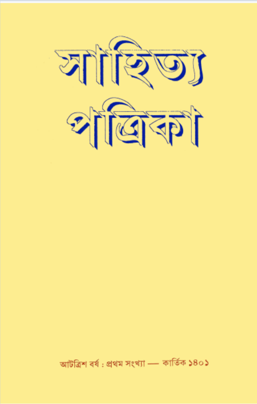

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিদ্দিকা মাহমুদা
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.5
Pages	75-98
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

সিদ্দিকা মাহমুদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল পরিচয় কবি হলেও একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। দীর্ঘ আট দশকের কর্মিষ্ঠ সময়ে একটি উপনিবেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি ভারতবর্ষের শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আন্দোলিত করেছে বারংবার। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট তিনি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার সমাধানের পথনির্দেশে সচেষ্ট হয়েছেন। কর্মী হিসেবে তিনি সর্বাধিক সংযুক্ত থেকেছেন শিক্ষাপ্রকল্পে।

শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন ১৮৯২ সালে রাজশাহীতে এক বক্তৃতায়, ১২৯৯ সালে 'শিক্ষার হেরফের' নামে তা মুদ্রিত হয়। এরপর অর্ধশতকে দেশে বহু পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি, দিয়েছেন বহু সংখ্যক বক্তৃতা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা দেশকল্যাণ নির্ভর, বাস্তবতার পরিবর্তনে বারংবার পরিবর্তনশীল। সকলের জন্যে শিক্ষা তাঁর অভীষ্ট এবং শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের কোনো বিকল্প তিনি মানেন না। তবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ। ঐতিহ্য ও সময়ের দাবীর সমন্বয় ঘটেছে তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। আর এ-সবের মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি কবির ঐকান্তিক ভালোবাসা ও দায়বোধ।।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অন্যতম পরিচয় তিনি একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। দীর্ঘ আট দশকের কর্মিষ্ঠ সময়ে নিসর্গ, নারী বা ঈশ্বরকেন্দ্রিক উপলব্ধি যেমন তাঁকে আন্দোলিত করেছে, তেমনি একটি ঔপনিবেশিক শক্তিকবলিত দেশে বসবাস করে সেখানকার শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সম্পৃক্ত বাস্তব সমস্যাও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট তিনি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার সমাধানের পথনির্দেশে সচেষ্ট হয়েছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নিজেই কর্মী হিসেবে গ্রহণ করেছেন উদ্যোগী ভূমিকা। ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী প্রতিভার যুগ্ম সংযোগ তাঁকে চলিষ্ণু রেখেছে আজীবন। হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয়-সাধক রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে কবি ও কর্মী, আনন্দলোকের অভিযাত্রী এবং কর্মযোগী। কর্মী হিসেবে তিনি সর্বাধিক সংলগ্ন ও সংরক্ত থেকেছেন শিক্ষাপ্রকল্পে। শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাচেতনা ও কার্যক্রম তাঁর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা তাঁর স্বদেশভাবনার অংশ।

জীবনস্মৃতির (১৯১২) পাতায় একটি প্রাথমিক স্কুল-উৎসাহী ও পরবর্তী স্কুলবিমুখ বালকের চিত্র পাওয়া যায়, অভিজ্ঞ শিক্ষক যাঁকে বলেছিলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫০ ঃ ৬]। কান্নার জোরে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি'তে ভর্তি হয়েছিল সেই বালক। কিন্তু পাঠদাতা বা পাঠপ্রসঙ্গ নয়, জীবনের প্রথম শিক্ষালয়ের যে অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে তাঁর স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে আছে তা হচ্ছে 'পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫০: ৬]। অতঃপর 'নর্মাল স্কুলে'র স্মৃতিচিত্রে পাওয়া যায় দুর্বোধ ইংরেজি শব্দাশ্রয়ী অর্থহীন সুরের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গ—'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং', উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যার পাঠোদ্ধার করেছিলেন - Full of glee, singing merrily, merrily, merrily' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫০: ২১]। এই স্কুলের একজন শিক্ষক অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন কুৎসিত ভাষা প্রযুক্তির কারণে, শৈশবেই বালকচিত্তে যার প্রতি অঙ্কুরিত হয়েছিল অপরিমেয় অশ্রদ্ধা। 'নর্মাল স্কুলে'র পর ফিরিঙ্গি স্কুল ' বেঙ্গল একাডেমি'-

> ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মতো - ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫০: ৩৯]।

অন্যদিকে ছিল ধনাঢ্য, সংস্কৃতিবান ঠাকুর পরিবারে গৃহশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষা স্কুলের পাঠক্রম ছাড়িয়ে যেত; পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যার পাশে অঙ্কন, *জিমন্যাস্টিক্‌সের* ন্যায় বিচিত্র বিষয়। নিঃসন্দেহে গৃহগত এই শিক্ষায় সুপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেখানেও অভিজ্ঞতা যে সবসময় প্রীতিকর ছিল না *ছেলেবেলা* (১৯৪০) গ্রন্থে তার পরিচয় উৎকীর্ণ:

> মাস্টার-মশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হ'ত মাস্টার-মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি ? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০০: ১০-১১]।

এই ধারণার সমর্থন মেলে উত্তরকালে *শিশু ভোলানাথ*-এর (১৯২২) 'মুর্খু' কবিতায় :

নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
  গুটিপোকার গুটি,

মুর্খু হয়ে রইব তবে?
আমার তাতে কীই বা হবে —
মুর্খু যারা তাদেরই তো
  সমস্তখন ছুটি।

প্রসঙ্গত *গল্পগুচ্ছ* -এর 'গিন্নি' গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতের ভয়ে দুটি ভাইবোনের খেলা ফেলে ভীতসন্ত্রস্ত পলায়ন এবং পণ্ডিতমশাই কর্তৃক নবতর নামকরণের দুর্ভোগে আশুর অপ্রস্তুত স্কুলজীবন, *লিপিকার* (১৯২২) 'তোতাকাহিনী' শীর্ষক রূপক-রচনায় পাঠ্যপুস্তকের শুকনো পৃষ্ঠা গলধ:করণ করা পাখিটির করুণ মৃত্যু, *অচলায়তন* (১৯১১), *মুক্তধারা* (১৯২২), *রক্তকরবীর* (১৯২৪) মুক্ত জীবনানন্দ কৃত্রিম পাঠ্যভারপীড়িত জীবনোৎসুক রবীন্দ্রহৃদয়ের সন্ধান দেয়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তিনি নিজে কোনো শিক্ষায়তনের সনদপত্র গ্রহণ করেন নি, কিন্তু জ্ঞান আহরণে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। স্কুল ছিল তাঁর স্বভাবের গভীরে। শিক্ষককে ফাঁকি দিলেও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো ফাঁক ছিল না।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র অভীষ্ট যে কেরানি উৎপাদনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থোদ্ধার এ-তথ্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার মৌল লক্ষ্য– একদিকে মন ও মননের পরিচর্যা এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক জীবনে তার উপযোগিতা পরীক্ষণ, এর কোনোটিই তিনি ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-কার্যক্রমে খুঁজে পান নি। সমগ্র জীবনে তিনি ইংরেজি-বাংলায় শতাধিক শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-অভিভাষণ উপস্থাপন করেছেন; চিঠিপত্র, ভ্রমণকথা, আত্মচরিত কিংবা ভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে শিক্ষা-সম্পর্কিত অনুচিন্তা। এ-সকল ক্ষেত্রে একদিকে যেমন উন্মীলিত তাঁর হৃদয়িক বেদনা ও বিক্ষোভ, অন্যদিকে তেমনি সুস্পষ্ট শিক্ষার পথ ও পাথেয় সম্পৃক্ত নিজস্ব অভিমত। তবে সময় থেকে সময়ান্তরে এই চিন্তাচেতনার মোড় ঘুরেছে, পরস্পর প্রতিবাদী হয়ে অন্তিমে তারা হয়েছে লক্ষ্যসন্ধানী; বস্তুপ্রতিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অগ্রবর্তী রবীন্দ্রচিন্তা। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল একান্তভাবে কাঙ্ক্ষিত এবং আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথে সমগ্র দেশ হয়েছিল একই সঙ্গে বেপথুমান এবং আত্মসন্ধানী। রবীন্দ্ররচনায়ও ছিল সেই আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের একান্ত প্রয়াস।

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করেন। রাজশাহী এসোসিয়েশনে প্রদত্ত এই ভাষণ এ বছর পৌষের (১২৯৯) *সাধনা* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রের সঙ্গে ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। এই প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী শিক্ষাভাবনার মূলসূত্রসমূহ উপস্থাপিত। যে শিক্ষার ভারবাহী এদেশের তরুণ শিক্ষার্থী তা যে আনন্দপ্রদ নয়, কল্পনাবৃত্তি ও মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনে নয় বিন্দুমাত্র সহায়ক, এমনকি আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনেও যে তার বিশেষ উপযোগিতা নেই, এ-সত্য উদঘাটনের সঙ্গে এ-তথ্যও তিনি উন্মোচন করেন যে, বন্দীশালার কারারুদ্ধ কয়েদীর মত পুনরাবৃত্তির ছকে ফেলে শিক্ষার্থীকে তা কেবলই 'পাস' এবং 'চাকরি'-অভিমুখী করে। আবার, শিক্ষার বাহন যেহেতু বিজাতীয় ভাষা এবং মাধ্যম অযোগ্য শিক্ষক, অতএব নিরন্তর ভুলের বোঝা বহন এবং মুখস্থবিদ্যার চর্চা ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কোনো অর্জন নেই; ভাব ও ভাষার অসংযোগ, শিক্ষার সঙ্গে চলমান জীবনের বৈপরীত্য কেবলই সময়ের অপচয় চিহ্নিত করে, বৃদ্ধি করে মানসিক দৈন্য। রবীন্দ্রনাথ এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মাতৃভাষাকে যথাযথ সেতু

হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ১৮৯৩ সালে *সাধনায়* (চৈত্র, ১২৯৯) প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)' প্রবন্ধে এই বক্তব্য অধিকতর সম্প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সহজ ও সুস্থভাবে জ্ঞানানুশীলনের জন্য মাতৃভাষা বাংলার কোনো বিকল্প নেই; তবে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই, বাংলার অনুষঙ্গী ভাষা হিসেবে বাল্যকাল থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন। 'ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষা শিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৭ : ৬২২]। এই একই বছর প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি' (সাধনা, আষাঢ়, ১৩০০) অংশে তিনি প্রচলিত শিক্ষার জনবিচ্ছিন্নতা ও এক্ষেত্রে মাতৃভাষার অসামান্য ভূমিকা সম্পর্কে পুনর্বার আলোকপাত করেন:

> ... ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে: লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৭ : ৫০৩]।

'প্রসঙ্গকথা ২'[১] প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে (*ভারতী*, বৈশাখ, ১৩০৫)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী; দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের অপরিহার্যতা এবং বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। তবে লক্ষণীয়, এক্ষেত্রেও তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা দানের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, সেইসঙ্গে বিজ্ঞানশিক্ষিত ছাত্রকে অযৌক্তিক সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বোলপুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে তপোবনের যে শিক্ষাদর্শ প্রচলিত ছিল এসময়

রবীন্দ্রনাথ তার পরম অনুরাগী। প্রাচীন গুরুগৃহ বাসের সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতাবর্জিত পরিবেশ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত শিক্ষার্থী এবং তেমনি উপযুক্ত শিক্ষক ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় এতকাল অনুদঘাটিত কর্মযোগের উদ্বোধন ঘটাতে, সেইসঙ্গে তাঁর লক্ষ্য ছিল শিশুচিত্ত যেন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনায় সহায়ক ছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী নেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) যার প্রভাবে আশ্রমিক প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রথম পর্বে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রাধান্য বিস্তার করে। উপাধ্যায়-আখ্যায়িত 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ এসময় হিন্দুসংহিতাসম্মত চালচলনের সমর্থক ছিলেন।

এরপর শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়পর্ব। বাঙালির জাতীয় জাগরণ ও আত্মানুসন্ধানী চেতনা উজ্জীবনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) চারণ কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন অদ্বিতীয় ভূমিকা। ঔপনিবেশিক শিক্ষাবর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক কার্যক্রম অধিকতর প্রাণবান হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী তিনি ছিলেন না, কিন্তু যে বিজাতীয় শিক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধ তার সমর্থন তিনি করতে পারেন নি। শৈশবাবধি আত্মসম্মান ও স্বাজাত্যবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠা তাঁর মত একজন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। স্বদেশের জীবনপদ্ধতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কালোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাসংস্কারে মনোযাগী হন। মূলত রাজনৈতিক ক্ষেত্র অপেক্ষা জাতীয় শিক্ষান্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্তি ছিল গভীর; কিন্তু জাতীয় নেতাদের চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে রবীন্দ্রনাথের পথ হয়ে ওঠে তাঁর একলা চলার পথ।

১৯০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত একটি সভায় কলকাতায় আগত পরীক্ষার্থী ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ প্রদান করেন। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ, ১৩১২) শীর্ষক এই রচনায় তিনি বিদেশী পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে দেশের জল-হাওয়া-মাটি ও মানুষের অন্তর্সম্পর্ক সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বদেশের ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম, লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে স্বীয় শক্তি ও স্বাধীনতা চর্চা করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান এবং বিদেশী পুঁথির পৃষ্ঠা থেকে আহরিত *'প্যাট্রিওটিজম'* শব্দটিকে বাস্তবে যথার্থ ফলিত করার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেন। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একজন তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক, প্রকৃত সমাজভাষাবিজ্ঞানী এবং *ফোকলোরিস্ট* হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন:

ক. বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র ভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৪]।

খ. পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেইসঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৪]।

গ. আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৫]।

দেশব্যাপী বৃটিশবিরোধী অন্দোলনসমূহের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং এই দাবির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রবীন্দ্রনাথও অন্নের দায়ে সরকারের দ্বারে বাঁধা বিদ্যার স্বাধীনতা চেয়েছেন। এ-বছর (১৯০৫) *ভাণ্ডার* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি প্রাইমারি শিক্ষাপ্রসঙ্গে সরকারি মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন:

... প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানরকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভালো নয়—শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষাশিক্ষাটা

প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৭ : ৫১৬]।

এ-কথা সত্য, ব্রিটিশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুধাবন করলেও দেশের প্রকৃত অবস্থার কেমন পরিবর্তন ঘটে নি; কমিশনের পর কমিশন বসেছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি লোকশিক্ষায় অনুরাগী ছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টিই তাঁর চিন্তায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। দেশের অজ্ঞ, নিরক্ষর কৃষকসম্প্রদায় শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের দুঃখভার নিজেরা লাঘব করুক, এই ছিল তাঁর কাম্য। দেশে বিরাজিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যাপক ব্যবধান তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। তবে লোকশিক্ষা সজীব ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য স্কুল-শিক্ষা অপেক্ষা যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির মাধ্যম ব্যবহারে তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে সাধারণ মানুষের ইতিহাসজ্ঞান এভাবে অনেক সহজে জাগ্রত ও পুষ্ট করা সম্ভব।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরিষদের নিয়মাবলি ও পাঠসূচি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। 'শিক্ষাসংস্কার' (*ভাণ্ডার*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩) 'শিক্ষাসমস্যা' (*বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১৩১৩), 'জাতীয় বিদ্যালয়' (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, ১৩১৩) ও 'আবরণ' (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, ১৩১৩) শীর্ষক প্রবন্ধচতুষ্টয়ে তিনি তপোবনের শিক্ষাদর্শ— সেই উদার প্রকৃতির সংস্রবে ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রতাপালনের মাধ্যমে চিত্তমুক্তির সাধনাকে নন্দিত করেন। চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চের আড়ম্বড়মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষীয় মন নিয়ে সীমাহীন জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করতে হবে, আপনাকে লাভ করার অমৃতমন্ত্র অর্জন করার জন্য উপকরণের বোঝা নয়, স্বাধীন উদ্যমের উপর হতে হবে নির্ভরশীল, চরিত্রকে করতে হবে সুস্থ ও আত্মবশ। ১৯০৯ সালে *প্রবাসী* (পৌষ, ১৩১৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধ যা তাঁর এই পর্বের শিক্ষাভাবনার নির্যাসস্বরূপ। *গীতা*-উপনিষদ-*রামায়ণ*, বুদ্ধদেব-কবীর-নানকের আদর্শ-উদ্বুদ্ধ সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যজগতে স্বচ্ছন্দবিহারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন আরণ্যক পূর্বপুরুষের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ একদা লাভ করেছিল যে সভ্যতার প্রেতি, সেই সাধনাই ভারতের জাতীয় সাধনা, যাকে বলা যায় 'যোগসাধনা', স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা যা শক্তিচর্চা করে না, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণতা অন্বেষণ করে। সমন্বয়সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে মুক্তি খোঁজেন নি, তিনি প্রসারিত হতে চেয়েছেন বিশ্বজাগতিকতায়, বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে তাঁর আত্মমুক্তির সন্ধান:

ক. ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:৯৭-৯৮]।

খ. এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ৯৯]।

গ. ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১০০]।

জাতিগত সত্তা রবীন্দ্রনাথ কখনও অস্বীকার করেন নি, ঐতিহ্যে দৃঢ়মূল থেকে তিনি হয়েছেন সর্বাস্তিবাদী । কিন্তু যে স্বাদেশিকতার অভিমানবশে মানুষ হয় কূপমণ্ডূক; উদার পরিগ্রহণে সমৃদ্ধ এবং পূর্ণতা-অভিলাষী হওয়ার পরিবর্তে সহস্র শৈবালদামে গন্তব্যভ্রষ্ট হয়, সেই জাতীয়তাবাদ তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। উত্তর পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের এই আন্তর্জাতিক চেতনা অধিকতর সম্পন্নতা প্রাপ্ত হয় তাঁর কর্মযোগে।

১৯১১ সালের ২৯ অক্টোবর রিপন কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ ১৩১৮) শীর্ষনামের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি মহাভারতের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত সেই বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার উল্লেখ করেছেন যা চিরায়ত লোহার ছাঁচে ঢালাই করা নয়; সজীব, প্রাণময়, গতিশীল, গ্রহণ-বর্জনে নিয়ত বিকাশমান, ব্যাপক এবং পরিবর্তনবহ – যেখানে নতুন নতুন মতবাদ, সমাজবিপ্লব বা ধর্মবিপ্লবের অনায়াস স্থান। রবীন্দ্রকথিত এই হিন্দুসভ্যতা অবশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদ অভ্যুত্থান-সময়ের নয়, বেদ-উপনিষদের কালের, যখন সমাজে ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা প্রবল হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন, সেই জঙ্গম সমাজ আজ আর হিন্দু সমাজ হিসেবে স্বীকৃতি পায় না, চলমান হিন্দু সমাজ অচলতা ও স্থবিরতার ভারবাহী। তাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের হিন্দুত্বের ধারণা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তথাপি স্বাতন্ত্র্যচেতনা সমর্থিত হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে, প্রাথমিক আত্ম-আবিষ্কার ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে সমগ্রতাস্পর্শী।

১৯১২ সালে 'ধর্মশিক্ষা' (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১৩১৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমের আদর্শ ব্যাখ্যাকল্পে বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন; এই সাধনা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের ব্যবধানহীন যোগে, প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে আনন্দ-আয়োজনে, তার উদারতা, বিস্তৃতি, ব্যপ্তি এবং অনন্ত অভিসারের সঙ্গে একাত্মবোধে—যেখানে কেবল ধ্যান নয়, ত্যাগ ও মঙ্গলকর্ম সহযোগী, সংযম ও স্বাধীনতা গ্রন্থিবদ্ধ; শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণময় সৃজনচিন্তা অঙ্গাঙ্গী। সমকালে ইংলন্ড-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানকার বিচিত্র পরীক্ষামূলক শিক্ষাপদ্ধতির পরিচয় ঘটে এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে', 'সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১২৫] হিন্দুসমাজসম্পৃক্ত দীর্ঘপোষিত রবীন্দ্রভাবনায় এসময় বিচলন লক্ষ করা যায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন জাতিভেদে আক্রান্ত অনড় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে:

> ... যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো ? [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১২৫]

সচেতন লেখক যথার্থই লক্ষ করেছেন:

> আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১২৫]।

প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার পথে রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রচলিত দুই শ্রেণির বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেছিলেন। রাজকীয় বিদ্যালয় তাঁর মতে কেরানিগিরির কল, অপরদিকে সামাজিক বিদ্যালয়ের পায়ে পুরোনো শিকল। এ-কারণে তিনি শিক্ষকপরম্পরা এবং শিক্ষাবিষয়ক নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে

অবরুদ্ধ শিক্ষাস্রোতকে সচল করে তুলতে চাইলেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক গ্রহণচারী মানসিকতা দ্বারা পরিস্রুত তাঁর 'জাতীয়'-ভাবনা:

> 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়'বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১২৮]।

১৯১২ সালে ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) প্রকাশিত 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' শীর্ষক অপর রচনায় একই চিন্তাচেতনার প্রলম্বন। একদিকে কৃত্রিম, অর্থহীন নিয়মপালনে বদ্ধ স্বসমাজ এবং অন্যদিকে রাজশক্তির কন্টকময় বেষ্টন কোনোদিক থেকেই উপনিবেশটিতে মুক্তির ডাক আসে নি। এ-কারণে জীবনের লক্ষ্য স্থির রেখে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সত্যসন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছেন। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাচীন ভারতের ত্যাগ ও সাধনাবহ ঐতিহ্য অবিরাম রবীন্দ্রহৃদয়ে জলসিঞ্চন করেছে।

১৯১৫ সালে *সবুজপত্র* পত্রিকায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'স্ত্রী শিক্ষা' (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২২) ও 'শিক্ষার বাহন' (পৌষ, ১৩২২)। জ্ঞানের জগতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো মতপার্থক্য ছিল না। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর ১৯০৮ সালে একটি ক্ষণস্থায়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু এদেশের পশ্চাৎবর্তী নারীসমাজ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন ১৯১২ সালে জ্ঞান ও মনীষাদীপ্ত পাশ্চাত্য নারীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের পর। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রয়োজনে নারীর জন্য শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন, তবে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ভেদনীতির সমর্থক। তাঁর অভিমত, বিদ্যার দুটি বিভাগের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না, কিন্তু স্বভাব ও ভূমিকা যেহেতু উভয়ের এক নয় অতএব ব্যবহারিক শিক্ষা পৃথক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুরুষ ও নারীর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমান অথবা নারী এতকাল পুরুষকর্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ—এ জাতীয় ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য, নারীস্বভাবে ভালবাসার অংশ অধিক বলে সে সংসারবন্ধনে সেবা, স্নেহ ও প্রেমদানে অভ্যস্ত;

অন্যদিকে পুরুষশ্রেণির শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ রাজ্যতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র চালিয়ে প্রকারান্তরে বারো আনা দাসত্ব তাদেরই বহন করতে বাধ্য করছে। পুরুষসম্প্রদায়ের পক্ষে এই রবীন্দ্রযুক্তি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য! তবে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৮৮-১৯৬১) লিখিত পত্র (৬ ভাদ্র, ১৩২৩) থেকে জানা যায়; 'সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯: ৫০] খোলার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। এমনকি অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) কাছে লেখা এক পত্রে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) তিনি এ-জাতীয় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'একদা' আশ্রমের 'নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৪:৮৪]। মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) যখন মেয়েদের ইংরেজি পড়ার বিপক্ষে কথা বলেছেন তখনও রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে (১৮৬৯-১৯৩৩) লিখিত পত্রে (২৪ ফাল্গুন, ১৩২৭) তাঁর ভিন্নমত জ্ঞাপন করেছেন। [ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী ১৩৯৭:১১৯]। সহশিক্ষা বা সহ-অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রহৃদয়ে কোন সংশয় ছিল না। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের (১৯১৮) পর ১৯১৯-এ মেয়েদের বোর্ডিং খোলা হয় এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যায়।

'শিক্ষার বাহন' রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বচ্ছ চিন্তা, বাস্তব জ্ঞান এবং নির্মোহ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রচিন্তা এক্ষেত্রে সরল ও ঋজুরেখ। এই প্রবন্ধে তিনি দ্বারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশী অপেক্ষা বাংলাদেশের প্রান্তবর্তী শিক্ষিত ছেলেটির সঙ্গে সুদূর ইয়োরোপের শিক্ষিত মানুষের নৈকট্য আবিষ্কার করেছেন। নিঃসন্দেহে জ্ঞানই মানুষের মধ্যে মিলনের শ্রেষ্ঠ সেতু রচনা করে; অথচ ভারতবর্ষে সেই জ্ঞানবিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক তার বাহন। ইংরেজি ভাষাসূত্রে শিক্ষা সর্বজনীন হতে পারে না। বিলেতি বিদ্যা সাইনবোর্ডসর্বস্ব, জীবনের ভেতরের সামগ্রী হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ১৪৩]। জাপানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, জাপান পশ্চিমের শিক্ষণীয় বিষয় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত করেছে অথচ 'জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১৪৯]। সুতরাং রবীন্দ্রমতে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা দুইই সম্ভব। এবং বাস্তবে তা ফলিত হলে ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙালির জ্ঞানার্জনে কোনও বাধা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাধারণের আয়ত্তগম্য করতে চেয়েছেন। তবে তিনি ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষাশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁর অভিমত:

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ১৫১]।

তিনি বাংলায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরের গ্রন্থ প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দান করেন। সেইসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার যে ছাঁচ দেশে প্রচলিত তার সংস্কারের দিকে। যদি যথাযথ প্রযত্ন ও পরিশ্রমে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা যায়, প্রচলিত ছাঁচ উপাসনার পরিবর্তে যা যথার্থ সজীব ও প্রাণময় তার কর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার চর্চা করা যায়, তবে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার দারিদ্র্য অপনোদন সহজেই সম্ভব হবে। স্বভাবতই রবীন্দ্র-মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল টোল-চতুষ্পাঠী, তপোবন, নালন্দা-তক্ষশিলাসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎসমূলে। গুরু ও শিষ্যের মিলিত সাধনা মাতৃভাষায় বিগলিত হয়ে মাতৃভূমি উর্বর করে তুলুক এই প্রার্থনাসহ তিনি প্রবন্ধটির উপসংহার টেনেছেন।

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইয়োরোপীয় অধ্যাপকের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রের সংঘর্ষকেন্দ্রিক প্রবন্ধ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' (*সবুজপত্র*, চৈত্র, ১৩২২)। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, 'ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১৬১]। একমাত্র প্রীতির দ্বারাই ইংরেজ শিক্ষকের পক্ষে ভারতীয় ছাত্রকে আকর্ষণ করা সম্ভব। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে আর্য, দ্রাবিড়, মুসলমান, ইংরেজ ইত্যাদি বিচিত্র জাতির সম্মিলিত ইতিহাস, ইতিহাসের এই সত্যতাকে মেনে নিতে তিনি দ্বিধা করেন নি:

এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১৬৫]।

রবীন্দ্রবিবেচনায় ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের একটিই এলাকা— শিক্ষাক্ষেত্র।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম মিলিত হল পরম ঐক্যসূত্রে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সহযোগে একটি সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জীর্ণ বার্ধক্য উপেক্ষা করে যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর পথে পথে পরিব্রাজক তিনি। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ আর নিছক ভারতবাসী নন, একইসঙ্গে ভারতীয় এবং বিশ্বমানব। ভারতবর্ষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এককালে তাঁকে ভীষণ ভাবিত করেছিল, এবার জাতীয় চিন্তাচেতনার ধারক হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক চেতনাধর। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী, কিন্তু বৈশ্বিক মানবসভ্যতার উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন আর শিক্ষার খণ্ডীভবন নয়, এবার মিলনের পালা। ১৯১৯-এর 'বিদ্যাসমবায়' (*শান্তিনিকেতন,* আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৬) এবং ১৯২১-এর 'শিক্ষার মিলন' (*সবুজপত্র,* ভাদ্র ১৩২৮ ; *প্রবাসী,* আশ্বিন ১৩২৮) প্রবন্ধের নামকরণ তার সাক্ষ্যবহ। পূর্ববর্তী (১৯১৯) 'অসন্তোষের কারণ' (*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) ও 'বিদ্যার যাচাই' (*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* আষাঢ়, ১৩২৬) প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা তুলে ধরে কালক্ষেপণ অনুচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন। 'বিদ্যাসমবায়ে' হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, ইংরেজ সকল জাতির সাধনার ধন বিদ্যাকে বিদ্যায়তনে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানালেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে ঘোষিত হল:

ক. ... এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ১৮০]।

খ. ... পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:১৮১]।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষ অধ্যাত্মশিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে যে-কারণে পাশ্চাত্য অশান্ত এবং প্রাচ্য দৈন্যপীড়িত। তিনি এই উভয় শিক্ষার মিলন কামনা করেছেন। এই ঐক্যের পথে বাধা তাঁর মতে *'ন্যাশনালিজম'*। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদ-লাঞ্ছিত ভারত, এশিয়া বা আফ্রিকার বেদনা-যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেও তিনি জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সর্বাত্মক ঐক্যবোধে প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেচনা করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। তিনি

বলেছেন, 'পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌, সত্য নয়...। ... স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শি[illegible]ই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতি[illegible] সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ১৯৫-৯৬]। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কালে এই সহযোগিতার ঐক্যমন্ত্র তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচিত করেছিল। স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭) ১৯২১ সালে গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে প্রতিবাদী প্রবন্ধ 'শিক্ষার বিরোধ' পাঠ করেন। কিন্তু কোনো ধরনের খণ্ডীভবন রবীন্দ্রদৃষ্টি মোহগ্রস্ত করে নি। একদা তাঁকে আপ্লুত করেছিল সনাতন হিন্দুধর্ম, সেই মোহমুগ্ধতার শিকল কেটে তিনি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন মানবধর্মে; আবার, জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনে যিনি ছিলেন অগ্রচারী, তিনিই হয়েছেন বিশ্বাত্মবাদী। *অচলায়তন*-এর গুরুর ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ভেঙেছেন চারদিকের স্বরচিত দেয়াল; চিন্তাজগতের এই বিবর্তন শিল্পরূপ লাভ করেছে *গোরা* (১৯১০) উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ড অতঃপর ভিন্ন আঙ্গিকে রূপ পরিগ্রহ করে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর তিনি শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন বিভাগ (১৯২২) এবং পল্লীবিদ্যালয় বা শিক্ষাসত্র (১৯২৪) প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ এবার ফিরেছেন শিকড়ের দিকে। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন ডিগ্রি অর্থাৎ জীবিকা বা চাকরির উপায়সন্ধান কখনও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে ভারতবর্ষের দরিদ্র, ভদ্র পরিবারের ছেলেদের জন্য সাংসারিক দায়ভার বহনের প্রয়োজনে পরীক্ষা পাস বা ডিগ্রি আহরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ-কারণে দরিদ্র গ্রামীণ ছাত্রদের সম্মুখে তিনি নিজেই উন্মুক্ত করেছেন জীবিকা উপার্জনের পথ; জোর দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিশিক্ষা, কাঠের ও চামড়ার কাজ, বয়ন ও কারুশিল্পের উপর। *টেকনোলজিকে* তিনি করতে চেয়েছেন গ্রামভিত্তিক। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষের কথা স্মরণ রেখে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন সুদূর আমেরিকায়। এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কর্ষিত হয়েছে শিলাইদহ-সুরুলের মত প্রত্যন্ত পল্লীঅঞ্চলে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি সৌন্দর্য ও আনন্দের অন্বেষণে নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষায় সবসময় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আসেন এল. কে. এলমহার্স্ট (১৮৯৬-১৯৭৪) যিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রবুদ্ধ বিশ্বখ্যাত পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)-র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ১৯২২ সাল থেকে তিনি শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন এবং বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে এলমহার্স্টের উদ্যোগে ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডার্টিংটন হল' নামক একটি স্কুল যেখানে শ্রীনিকেতনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল। উপাধ্যায় থেকে

এলমহার্স্ট—রবীন্দ্র শিক্ষা উপদেষ্টাদের এই বিবর্তনও লক্ষ্যযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শুধু পাশ্চাত্যে নয়, ইন্দোনেশিয়া-শ্রীলংকার ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ডেও রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বের বাস্তব প্রযুক্তি ঘটেছে।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এখানে সমগ্র জীবনের আরাধ্য শিক্ষাদর্শের বাস্তব প্রযুক্তি তাঁকে অভিভূত করে। *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন:

ক. এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ২৯৭]।

খ. বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৩১৬]।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কেবল মনীষার বাহনরূপে নয়, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের সর্বময় প্রকাশ-মাধ্যম রূপে দেখতে চেয়েছিলেন ; তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হোক এবং তা ছড়িয়ে যাক সর্বস্তরে। লোকশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে এদেশের আর্থসামাজিক বিবিধ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব এ-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন দৃঢ়মূল। রাশিয়া থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন 'আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬:৪৫৩]। অজ্ঞতা-অন্ধতা-কুসংস্কার পীড়িত স্বদেশভূমির জন্য এ-পর্যায়ে শান্তিনিকেতন অপেক্ষা শ্রীনিকেতনের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ, কর্মপদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তার উপযোগিতা তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুধাবন করেছিলেন।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত সভায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের দুটি অভিভাষণ, যথাক্রমে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' এবং 'শিক্ষার বিকিরণ' পৃথক পুস্তিকারূপে ১৯৩৩ সালে

আত্মপ্রকাশ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসংক্রান্ত পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণা অভিব্যক্ত। প্রথম প্রবন্ধে শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহ্যচ্যুতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। একদা নালন্দা-তক্ষশিলায় যে প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই, তা ইংরেজের অবদান; সেই দানে যেমন দাক্ষিণ্য নেই, তেমনি ভারতীয় বিদ্যার প্রবহমান ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি নিজস্ব ভাষা-মাধ্যমে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছে এখানে বিদেশী ভাষা ও মুখস্থ বিদ্যার সহায়তায় তা পরিবেশনের প্রয়াস। ফলত অন্যত্র সৃজনশীলতার চর্চা, এখানে কেবলই অনুকরণ এবং ভারবহন। বিদ্যা আর চিত্তের সম্পদে উত্তীর্ণ হয় না, সর্বসাধারণের মধ্যে ঘটে না তার ব্যাপ্তি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, এককালে টোল-চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রিক শিক্ষা প্রদান করা হলেও তা বিদ্বানের একান্তসামগ্রী ছিল না; রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ধর্মব্যাখ্যা ইত্যাদি নানা শাখা-প্রশাখায় সেই কঠিন বিদ্যা সর্বজনগম্য হয়ে উঠত। কিন্তু যখনই সেই 'স্বৈচ্ছিক' শিক্ষা গ্রাম থেকে সরে কেন্দ্রীভূত হল শহরে তার রূপও গেল পাল্টে। রবীন্দ্রভাষ্য :

> এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।
>
> শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেনড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ২১৬]।

এই যে শিক্ষা বিকীরিত হওয়ার পরিবর্তে সংকুচিত হয়ে গেল, থেমে গেল তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, গ্রাম ও নগরের মধ্যে চালানো হল বিচ্ছেদের ছুরি, রবীন্দ্রনাথ একে আধুনিকতা বলতে পারেন নি। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আধুনিকতা এমন 'সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২১৬]। এই ব্যবস্থার ফলে এদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচিত হয়েছে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। 'ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২১৮]। সুতরাং রবীন্দ্রমতে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় অবলুপ্ত

জনশিক্ষাবিধির সহজগম্য পথগুলোর যেমন পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, তেমনি সর্বসাধারণের সঙ্গে চিত্তের যোগ স্থাপনের জন্য মাতৃভাষাকে করতে হবে শিক্ষার বাহন। শিক্ষা সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না হলে একটি জাতির সার্বিক মুক্তি সম্ভব হয় না। 'মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ন করে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২২১]। তিনি আরও বলেছেন, স্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা প্রসারিত করে সাহিত্য, অতএব সেই সাহিত্যকে 'সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২২১]; শুধু রসসামগ্রী পরিবহন করা তার দায়িত্ব নয়। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঝোঁক যে এদিকে, এ-সত্যটিও তিনি উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর বক্তব্য:

> কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ; পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২২০]।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন—বিশ্ববিদ্যালয় মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে তার স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করুক। সহজ ও ব্যাপক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে পরীক্ষা-পাঠ্য বইগুলো বিদ্যায়তন-বহির্ভূত শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মুহম্মদ আজিজুল হকের কাছে একটি পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রাদেশিক শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমে পরীক্ষাগ্রহণ এবং উপাধিদানের মাধ্যমে লোকশিক্ষাবিস্তার ও লোকজীবিকা প্রসারে সহায়তা করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন যা একালের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের কথা স্মরণগোচর করে।

রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আগ্রহী শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যা যেমন পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, তেমনি তা বহুবিষয়কন্টকিত না রেখে শিক্ষার্থীর মানসপ্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ বিষয়ভিত্তিক করার আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

১৯৩৫ সালে *বিচিত্রায়* (শ্রাবণ, ১৩৪২) প্রকাশিত 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' শীর্ষক পত্রপ্রবন্ধে (ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত) তিনি শিক্ষার নান্দনিক দিক সুন্দরভাবে

উন্মোচন করেন। শিক্ষার অর্জন যে নিছক উপকরণবান হওয়া বা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভ নয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন—ইন্দ্রিয়দমনের তৎপরতায় জীবনীশক্তি, মননশক্তি ও কর্মশক্তির বিকাশ, এই সত্য করেন সুচিহ্নিত। সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ কিভাবে জাগ্রত ও বিকশিত হয় তার চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উক্ত প্রবন্ধে:

> সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২২৬-২৭]।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ উদ্‌যাপনকালে রবীন্দ্রনাথ নিউ এডুকেশান ফেলোশিপের কলকাতার অধিবেশনে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' (*প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৪২) এবং 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (*বিশ্বভারতী বুলেটিন*, মাঘ, ১৩৪২) শীর্ষক দুটি ভাষণ প্রদান করেন। প্রথম প্রবন্ধে বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগে সংগীত যে কলাবিদ্যার অন্যতম বিষয় হতে পারে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অপর প্রবন্ধে তিনি পুনরায় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার কথা, দেশের মাটির সঙ্গে তার বিচ্ছেদজনিত অসম্পূর্ণতার কথা উচ্চারণ করেছেন যা 'আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২২৯]। তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়েছেন, 'নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ২২৯]। অর্থাৎ যে শিক্ষার সঙ্গে দেশের চিত্তের যোগ নেই, সেই শিক্ষা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তিনি যে বারবার এদেশের 'সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে'র কথা মানুষকে জানিয়ে যাচ্ছেন অথচ বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে না—, এ-তথ্যও তিনি উন্মোচন করেছেন।

এদেশের শিক্ষা-ইমারত সিঁড়িশূন্য, অর্থাৎ নীচতলার সঙ্গে উপরতলা সম্পর্কহীন, শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের সঙ্গে অশিক্ষিত বৃহদাংশ জনতার পার্থক্য দুস্তর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাল ছাড়েন নি। তাঁর বক্তব্য, 'তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ২৩০]। তিনি অনুধাবন করেছেন, 'আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত' এই সমাজে 'একই নদীর একই পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ২৩১]। তাই তিনি বার বার তুলে এনেছেন রাশিয়ার দৃষ্টান্ত— উল্লেখ করেছেন সেখানকার ইন্দ্রজালতুল্য শিক্ষাবিস্তারের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা। রবীন্দ্রমতে একদা এদেশে শিক্ষা টোল-চতুষ্পাঠীতে পাণ্ডিত্যচর্চায় আবদ্ধ থাকলেও সংস্কৃতির ধারারূপে যেমন সর্বজনের কাছে পৌঁছে যেত, প্রচলিত বিজ্ঞানসন্ধ পাশ্চাত্যশিক্ষা সেভাবে জনচিত্তমূলে উপনীত হতে পারছে না। প্রাচ্যে বিদ্যাদান ছিল ব্রতস্বরূপ, যেখানে নিষ্ঠা, সৌজন্য, সরলতা, হৃদ্যতার সম্বন্ধ। অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানপ্রণালি পদ্ধতিনির্ভর, প্রতিযোগিতামূলক, আড়ম্বরপূর্ণ; তার উপকরণবাহুল্য দরিদ্র দেশটির পক্ষে অনুপযোগী। উপরন্তু, বিদেশী ভাষা-শৃঙ্খলে তা আবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

> শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৩৬]।

অতএব, আর সময়হরণ নয়, শিশু যেমন আপন সমগ্রতা আভাসিত করে, তেমনি সমগ্রের অভীপ্সা নিয়ে গড়ে উঠুক বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়, হোক তার শিশুমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, অন্যান্য দেশে বিদেশী ভাষা কেবলমাত্র প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া হয়, দেশীয় সমস্ত কাজই চলে দেশীয় ভাষায়, অথচ আমাদের দেশে সেই স্থান অধিকার করেছে ইংরেজি ভাষা। তিনি তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার আলোকে (এগার বছর পর্যন্ত তাঁর কাছে বাংলা ভাষার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না) এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিশুমনের লালন ও বিকাশের জন্য, তার চিন্তা ও ভাবসমূহ কথার প্রকাশ করার প্রাথমিক অবলম্বন হিসেবে মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। বিদেশী ভাষা এক্ষেত্রে মুখোশ-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শুনিয়েছেন- 'মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত

ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৪৩]।

১৯৩৬ সালে রচিত 'আশ্রমের শিক্ষা' (*প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৪৩) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ বর্ণনাপ্রসঙ্গে এদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসলোকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষকশ্রেণি নিজেদের প্রবীণ প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে ছাত্রদের থেকে দূরবর্তী হন অথবা 'তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ২৪৯]। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ক্ষমতায় যারা অসম, তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯:২৪৯]। কিন্তু শিক্ষককে হতে হবে ধৈর্যশীল; তাদের অসহিষ্ণুতা বা শক্তির অভিমান যেন স্নেহকে অতিক্রম করে না যায়। তাঁর মতে, তপোবনের আদর্শে গড়ে ওঠা আশ্রমে রয়েছে গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সেখানে শিষ্যের চিত্ত গতিশীল করে তোলা যেমন গুরুর সাধনার অঙ্গ তেমনি তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ শিষ্যকে করে অনুপ্রাণিত। তিনি আরও লক্ষ করেছেন 'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ২৪৬]। বিরাট প্রকৃতির নাড়িতে যে প্রাণের বেগ, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সেই স্পন্দন লাগুক ছেলেদের দেহে-মনে, তাই তাদের শিক্ষা দেয়া হোক 'শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে'। শিক্ষায়তন হিসেবে রবীন্দ্রবিবেচনায় আশ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট। আশ্রমের শিক্ষাই পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা। 'সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতার' মাধ্যমে শিক্ষার্থী মিশে যায় আশ্রমজীবনের সঙ্গে, একত্রবাসের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, উপকরণের বাহুল্য তার সৃজনশীলতা ও উদ্যম বিনষ্ট করে না; নিজের চেষ্টায় নিজের চারদিকে সে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যের লাবণ্য ছড়িয়ে দেয় এবং এভাবেই 'সৃষ্টিকর্তৃত্বে'র মাধ্যমে চলে 'আত্মকর্তৃত্বচর্চা'র সাধনা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যার আজন্ম-উপাসক।

উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালের মে মাসে দীর্ঘলালিত লোকশিক্ষাবিস্তারের স্বপ্ন ফলিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ। দেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দিয়ে সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের লক্ষ্যে গৃহীত হয় 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকল্প। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় পদক্ষেপ তাঁর চিন্তা ও কর্মের ঐক্য-নির্দেশক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। *ছাত্রসম্ভাষণ* নামে বিশ্ববিদ্যালয় তা পুস্তিকা

আকারে প্রকাশ করে (১৯৩৭)। এই রচনায় তিনি পুনরুত্থাপন করেছেন ভারতবর্ষে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ভাষা-বৈষম্যের প্রসঙ্গ, তার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য:

> আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এঁকে অঙ্গীকার ক'রে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোকে জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ২৫১-৫২]।

তিনি বিশ্বাস করেছেন, 'রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ২৫১-৫২]।

ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্য যে ফলবান হয়েছে, এ-সত্য স্বীকারে রবীন্দ্রনাথ কখনও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর বক্তব্য, 'মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ২৫৩]। তাছাড়া, বর্তমান যুগ যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা দ্বারা অধিকৃত এবং পৃথিবীর নবজাগ্রত দেশসমূহ সেই উদ্যমশীল চিত্তস্রোত জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করে সংসার-যাত্রায় কৃতার্থতালাভের প্রয়াসধন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন তা নির্দেশ করেছেন, তেমনি অনুক্ত রাখেন নি এক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় পশ্চাৎবর্তী ভূমিকার কথা। আবার, সত্যদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের লোভের চেহারাটিও উন্মোচন করতে দ্বিধা করেন নি:

> আমি জানি, য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধ'রে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯: ২৫৬]।

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ—বেদ-উপনিষদ থেকে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) অথবা সক্রেটিস (খ্রি পূ. ৪৬৯-৩৯৯), রুশো (১৭১২-১৭৭৮), পেস্তালজ্জি (১৭৪৬-১৮১৭), সি. এফ. পার্কার (১৮৩৭-১৯০২), ডিউই, পল গেহিব শিক্ষাতত্ত্ববিদদের ভাব-ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতই নৈকট্য থাক, তিনি কথা বলেছেন তাঁর নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে, পারিপার্শ্বিক সকল সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা মনে রেখে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটেছে, দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অথবা বিদেশী সরকার তাঁর বিরোধিতা করেছেন, সাধারণ মানুষও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মানপত্রের মূল্যমানের কারণে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হার মানেন নি; তাঁর সকল শ্রম ও শক্তি নিয়ে এককভাবে সকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন। উত্তরকালে অবশ্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) মত পরিবর্তন করেছেন, মূলত উপনিবেশবাদ বিরোধী নয় বলে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭) কর্তৃক তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নন্দিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়েছেন এই আশঙ্কায় যে, যে প্রথানুগতির বিরুদ্ধে তাঁর যাত্রা সূচিত অন্তিমে সেই প্রথাবদ্ধতাই হয়তো সবকিছু গ্রাস করতে চলেছে। কেননা, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে কিছুটা আপোষ করতে হয়েছিল।

তবে প্রযুক্তিক্ষেত্রে রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বের সাফল্য কতটুকু সেই পরিমাপে না গিয়েও বলা যায়, এই স্বচ্ছ, মুক্ত ও সহৃদয় চিন্তা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাসংক্রান্ত রবীন্দ্রচিন্তা স্থাণু নয়, সংকীর্ণ নয়, বরং ক্রমবিবর্তনশীল; গ্রহণ-বর্জন-আত্মীকরণের মাধ্যমে শ্রেয়োবুদ্ধির পথে তা চালিত। শিক্ষাই যে যে-কোনো জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি এবং তা সর্বত্রগামী হওয়া অত্যাবশ্যক এবং তা সম্ভব একমাত্র মাতৃভাষার কল্যাণে এ-সত্য যেমন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সাহায্যে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সাঙ্গীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু কখনোই বিস্মৃত হন নি জাতীয় সত্তার কথা। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সহাবস্থানে চলেছে তাঁর ভবিষ্যতের পথসন্ধান। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি হাতে-কলমে প্রায়োগিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় অধ্যাত্মগৌরব অস্বীকার না করে অঙ্গীকার করেছেন বিজ্ঞানশিক্ষা। ঐতিহ্যে থেকেছেন স্বনিষ্ঠ অথচ সময়ের দাবি উপেক্ষা করেন নি। বিশেষ কোনো মতাদর্শে আবদ্ধ না থেকে রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজেকে অতিক্রম করেছেন। বস্তুত দেশকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত তাঁর শিক্ষাবিষয়ক সকল ভাবনা ও কার্যক্রম। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই সমাজসম্পৃক্ত চিন্তাচেতনা নিঃসন্দেহে দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসা ও

দায়বোধ থেকে উৎসারিত। উল্লেখ্য, A Poet's School (*Visva-Bharati Quarterly*, Oct, 1926) শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রকল্পকে একটি কবিতা লেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন যা ভাষা দিয়ে নয়, অন্য মাধ্যমে বিরচিত।।

গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা:
১৩৪৯	বিশ্বভারতী।
১৩৫০	*জীবনস্মৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।
১৩৮১	*চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড। কলকাতা:
	বিশ্বভারতী।
১৯৭৬	*রবীন্দ্ররচনাবলী*, বিংশ খণ্ড। কলকাতা:
	বিশ্বভারতী।
১৩৮৭	*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা:
	বিশ্বভারতী।
১৩৮৭	*শিশু* ভোলানাথ। কলকাতা:বিশ্বভারতী।
১৩৮৯	*শিক্ষা*। কলকাতা:বিশ্বভারতী।
১৪০০	*ছেলেবেলা*। কলকাতা:
	বিশ্বভারতী।
জয়শ্রী চক্রবর্তী	*রবীন্দ্রপত্র ঃ রবীন্দ্রভাবনা*। কলকাতা :
১৩৯৭	সাহিত্যশ্রী।